Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জড়বাদী নীতিবিদ্যা থেকে অধ্যাত্মবাদী নীতিবিদ্যায় উত্তরণের বাধ্যবাধকতা: একটি বিশ্লেষণ

সুষেণ মণ্ডল
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

Abstract:

All readers of Indian philosophy are aware that the Chārvāka philosophy is as much an extreme materialist as the Advaita Vedānta philosophy. Although these two opposing Schools are widely admired by general people, Chārvāka seems to be more popular than Advaita in philosophical discussions regarding the origin and development of the world and moral conduct. But even if we can influence our consciousness like Chārvāka about moral behavior, we seem to be a little compelled to have a negative attitude towards it. It is as if the Chārvāka have expressed the words of our souls in philosophical language. But even after that why we are somewhat compelled to deviate from Chārvāka ethics and this, I think, has not been discussed enough in the philosophical circles. Most of the philosophers have stopped only criticizing Chārvāka's views. But where is our obligation to take a different view? In the present article, I will try to analyze the unseen aspect of the cause of our reluctance to adopt the Chārvāka philosophy. In this regard, I will first try to unravel the nature of our emotional situation by analyzing the nature of the philosophy of both the communities and comparing them.

Key words: জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, অদ্বৈতবাদ, নীতিবিদ্যা, সুখবাদ

ভূমিকা: ভারতীয় দর্শনের পাঠক-পাঠিকা মাত্রই অবগত আছেন যে চার্বাক দর্শন যেমন চরম জড়বাদী অদ্বৈতবাদী বেদান্ত দর্শনও তেমনি চরম অধ্যাত্মবাদী। বিপরীতধর্মী এই দুই সম্প্রদায় ভারতীয় জনমানসে বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও জগতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনায় চার্বাক মত যেন অদ্বৈত মত থেকে অধিক জনপ্রিয়। কিন্তু নৈতিক আচরণ সম্পর্কে চার্বাক মত আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারলেও আমরা যেন কিছুটা বাধ্য হয়েই তার থেকে বিরূপ মনোভাব পোষণ করি। চার্বাকগণ যেন আমাদের প্রাণের কথাই দার্শনিক ভাষায় তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার পরেও কেন যে আমরা কিছুটা বাধ্য হয়েই চার্বাক নীতিবিদ্যা থেকে বিমুখ হই - এই বিষয়ে, আমার মনে হয় দার্শনিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। বেশিরভাগ দার্শনিকই চার্বাক মতের বিরূপ সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন মত গ্রহণে আমাদের বাধ্যবাধকতা কোথায় তা যেন কিছুটা অন্ধকারেই থেকে গেছে। অনেকটা যেন আমরা নিজেরাই নিজেদের অন্ধকার দিকটির স্বরূপ উন্মোচন করতে পরাঙমুখ। বর্তমান লেখায় আমি চার্বাক নীতিদর্শন গ্রহণে আমাদের অনীহার কারণ বিষয়ক সেই অনালোকিত দিকটিকেই

বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। এবিষয়ে আমি প্রথমে উভয় সম্প্রদায়ের নীতিদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে আমাদের মানসিক পরিস্থিতির স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব।

চার্বাক জড়বাদ: 'চার্বাক' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। অনেকে মনে করেন 'চার্বাক' নামে কোন এক ঋষি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং তারই নামানুসারে এই দর্শনকে চার্বাক দর্শন বলা হয়। "অনেকে আবার 'চার্বাক' নামে কোন ঋষি ছিলেন কিনা এবিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, 'চার্বাক' নামটি এসেছে 'চারু বাক' থেকে। 'চারু' অর্থে শ্রুতিমধুর, 'বাক্' অর্থে কথা। 'চারুবাক' কথার মানে হল শ্রুতিমধুর বা মনোরম কথা। ইন্দ্রিয়লিপ্সু সাধারণ মানুষের কাছে চার্বাকদের কথা খুবই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম"।[১] একমাত্র চার্বাক দর্শন ভিন্ন ভারতের সকল সম্প্রদায়ই কমবেশি আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন। ভারতীয় দার্শনিক সমাজে চার্বাক দর্শনই একমাত্র কঠোর জড়বাদী। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মধ্যে চার্বাক জড়বাদ যেন অনেকটা চন্দ্রের কালিমার ন্যায় সমুজ্জ্বল হলেও তা যেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকেই পরিপুষ্ট করেছে। চার্বাকদের জড়বাদী তত্ত্বচিন্তার মূলে হল, তাদের অভিনব জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ, যে মতবাদের মূল কথা হল, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলা হয় আর এই যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে বলা হয় প্রমাণ। অন্যান্য অধিকাংশ দার্শনিক সম্প্রদায় যেখানে অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদিকেও যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে স্বীকার করেন সেখানে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। 'বরদরাজ তার্কিকরক্ষায় এই চার্বাক মত অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন, 'প্রত্যক্ষনেকং চার্বাকাঃ''[২] আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এর সাহায্যে যেহেতু ঈশ্বর, পরলোক, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, তাই তারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাসী আধ্যাত্মিকতা বিরোধী মত পোষণ করেন এবং আমাদের সকলের অনুভূত এই জড়জগতকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন। তাদের মতে অচেতন জড়জগতই একমাত্র সত্য এবং প্রাণ, মন, আত্মা বা চৈতন্য জড় থেকে উদ্ভুত। চার্বাকদের এই ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অতিন্দ্রীয় তত্ত্বের বিরোধী মতকে জড়বাদ বলা হয় এবং ভারতীয় দর্শনে জড়বাদের প্রচারক হিসেবে চার্বাকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চার্বাকদের এই কঠোর জড়বাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় তাদের নৈতিক মতবাদে।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব: চার্বাকগণ দৈহিক সুখ বা কাম এবং তার সাধন অর্থকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলেছেন। পুরুষার্থ বলতে বোঝায়, "যেন প্রযুক্ত; পুরুষঃ প্রবর্ততে, স পুরুষার্থঃ"[৩] অর্থাৎ পুরুষ যার দ্বারা প্রবৃত্ত বা যত্নবান হয়ে কোন কর্ম সাধনে প্রযুক্ত হয় তাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থের লক্ষণে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, 'যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিস্পার্থ লক্ষণ অবিক্তত্বাৎ'৪/১/২ অর্থাৎ যে বিষয়ে পুরুষের প্রীতি হয় তাই পুরুষার্থ। এখানে পুরুষ বলতে সচেতন মানুষ মাত্রকেই বোঝান হয়েছে। সুতরাং বলা যায় মানুষ সচেতনভাবে যা কামনা করে তাই পুরুষার্থ। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় চতুর্বর্গ পুরুষার্থ স্বীকার করেন অর্থাৎ তারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটিকে মানব জীবনের পরম কাম্যবস্তু বলেন। কিন্তু "চার্বাক দার্শনিকের কাছে 'কাম'ই একমাত্র পুরুষার্থ। 'অর্থ' কাম চরিতার্থ করার উপায় মাত্র"।[৪] অর্থাৎ চার্বাকগণ ধর্ম ও মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার না করে শুধুমাত্র 'অর্থ' ও 'কাম'কেই কাম্যবস্তুরূপে স্বীকার করেন। চার্বাক দর্শন অনুসারে, "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ – অর্থাৎ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখেই জীবন অতিবাহিত করিবে। মৃত্যুর অগোচর অর্থাৎ বিনাশ রহিত

কোন কিছু নাই। ভস্মীভূত দেহের পুনরায় আগমন কি কারণে হইবে অর্থাৎ কোন কারণেই হইতে পারে না- এই লোকগাথার অনুবর্ত্তন করিয়া, নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুসারে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ মনে করিয়া, পারলৌকিক স্বর্গ, দেবতা, পাপ ও পূণ্য প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অপলাপ করিয়া চার্বাক মতের অনুবর্ত্তন করিতে দেখা যায়"।[৫]

প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী চার্বাকদের নৈতিক অভিমতের মূলকথা হল, কীভাবে ইহজগতের যাবতীয় সুখ-সম্ভোগ সুসম্পন্ন করা যায় তার অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ চার্বাক নীতিতত্ত্বের মূল অভিমুখ হল কিভাবে ইহজাগতিক সুখ সাচ্ছন্দ্যকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করা যায়। চার্বাক সম্প্রদায় মনে করেন, দেহধারণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার উদ্দেশ্যই হলো সুখ ভোগ। অর্থাৎ তাদের নিকট বেঁচে থাকার একমাত্র আদর্শ হল যেন তেন প্রকারেণ জাগতিক সমস্ত প্রকারের সুখ সম্ভোগ। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে চার্বাকদের নৈতিক ধারণার বিশ্লেষণে বলেছেন, বৈষয়িক ও জাগতিক সুখ ভোগই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে বাঁধা বা বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে বিষয় রসে মগ্ন হতে তারা প্রয়াসী। ইহজগতের ভোগসুখকে উপেক্ষা করে কৃচ্ছসাধন চার্বাকদের অভিপ্রেত নয়। দুঃখ মিশ্রিত বলে ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। "চার্বাক মতে, বর্তমান সুখই বাস্তব সত্য। কাজেই ভবিষ্যতের (পরকালের) না-পাওয়া অনিশ্চিত সুখের আশায় বর্তমানের সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মিথ্যা পরকালের সুখের আশায় কেবল মূর্খেরাই বর্তমানের, ইহজীবনের সুখকে অবহেলা করে। চার্বাক বলেন, আগামীকাল পেতে পার এমন এক রমণীয় ময়ূরের তুলনায় তোমার আয়ত্ত্বে থাকা একটি কপোত অনেক বেশি মূল্যবান। কেননা অতীত তোমার নয়; ভবিষ্যৎ বিশ্বাসযোগ্য নয়; বর্তমানই কেবল প্রত্যক্ষগোচর। চার্বাক তাই বলেন, 'পিব খাদ চ' - যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা জীবন সার্থক কর। চার্বাকদের নৈতিক উপদেশ হল, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ'-যতদিন বাঁচবে ভোগসুখে বেঁচে থাক, প্রয়োজনে ঋণ করেও ঘৃতাদি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পাণীয় পান কর"।[৬]

চার্বাক নীতিদর্শনের কথাগুলি এতই শ্রুতিমধুর ও রমণীয় যে কামনা-বাসনা বিদুর আমাদের মন তা পরম বাঞ্ছিত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে চার্বাকদের এই মনমুগ্ধকর কথাগুলি যতই রমণীয় হোক না কেন, এর স্ববিরোধিতা আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে পারে না। যেমন আমরা যতই সুখ কামনা করি না কেন, কেউ যদি আমাদের স্বার্থবাদী বলে, আমরা তার প্রতিবাদ না করে পারি না। সুখ যদি আমাদের একান্ত কাম্যবস্তু হবে তাহলে নিজের সুখের জন্য আমরা স্বার্থপর হতে পারব না কেন? কেন অপরের সুখের জন্য আমরা আত্মবিসর্জন করি এবং কেনইবা অপরের দুঃখে অশ্রুপাত করি - এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর চার্বাক নীতিতত্ত্বে পাওয়া যায় না। এ লেখার পরবর্তী অংশে অদ্বৈত তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে এসব প্রশ্নেরই উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

অদ্বৈত তত্ত্ববিদ্যা: কোন তত্ত্বের সংগতি নির্ভর করে তা কতটা অন্যান্য সঙ্গতিসম্পন্ন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম এবং কতটা নিজেকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তার উপর। অন্য কথায় বলা যায়, দার্শনিকগণ যে আধিবিদ্যক পরমতত্ত্বের কথা বলেন, তা সঙ্গতিসম্পন্ন হবে যদি তা তার নিজের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব কোন আধিবিদ্যক পরমসত্ত্বাকে স্বীকার করেননি তাই তাদের এই বস্তুজগতকে ব্যাখ্যা করার ঝামেলা নেই। বস্তুজগতই তাদের নিকট একমাত্র সত্য এবং তা আমাদের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়ায় তাকে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র চৈতন্যের আবির্ভাব বিষয়ে তাদের যে সমস্যা তাও তারা আকস্মিকতার আশ্রয় নিয়ে এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন আধিবিদ্যক পরমতত্ত্বরূপে ব্রহ্মকে স্বীকার করেন। তাই তাদেরকে ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে জগৎ

কিভাবে আবির্ভূত হয় সে বিষয়টিকেও ব্যাখ্যা করতে হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তারা আমাদের সকলের অনুভূত এই ব্যাবহারিক জগতকে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এখন দেখাযাক, অদ্বৈত বেদান্তী তাদের পরমতত্ত্ব এবং তার থেকে নিঃসৃত এই বস্তু জগৎ সম্পর্কে কি বলেছেন।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ – অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন"।[৭] সুতরাং অদ্বৈত দর্শনে পরমতত্ত্ব হিসেবে ব্রহ্মকে স্বীকার করার পাশাপাশি আমাদের সকলের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত এই বস্তু জগতকে মিথ্যা বলা হয়েছে। সেজন্য অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তারা বাহ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু 'বাহ্য জগতকে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাকে সরাসরি মিথ্যা বলে জগতকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন' এমন অভিযোগ করলে অদ্বৈত দর্শনকে অনেকটা লঘু করে দেখা হয়, তার সঠিক বিচার হয়না। তার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের দেখতে হবে অদ্বৈত বেদান্তী ঠিক কোন অর্থে জগতকে মিথ্যা বলেছেন অর্থাৎ 'মিথ্যা' শব্দটি তাঁরা কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তে 'মিথ্যা' শব্দের বিভিন্ন লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত দুটি লক্ষণ এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। প্রথম লক্ষণে বলা হয়েছে "যা অবাধিত নয়, বাধিত, তাই মিথ্যা"[৮] স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয় অর্থাৎ স্বপ্নকালে আমাদের যেসব অভিজ্ঞতা হয় স্বপ্ন ভেঙে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে তা মিথ্যা ছিল। কোন ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুভব হয়। অন্ধকারে যখন রজ্জুতে সর্পের অনুভব হয় তখন যতক্ষণ না আমরা রজ্জুকে রজ্জু বলে অনুভব করছি ততক্ষণ সর্পই আমাদের নিকট সত্য বলে মনে হয়। উজ্জ্বল আলোতে সর্পজ্ঞান বাধিত হলে আমরা বুঝতে পারি সর্পজ্ঞান ভ্রম ছিল। এইরূপ সর্পজ্ঞানকেই মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার দ্বিতীয় লক্ষণে বলা হয়েছে "যা সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা। 'বিলক্ষণ' অর্থ ভিন্ন, সুতরাং যা সৎ থেকে ভিন্ন, আবার অসৎ থেকেও ভিন্ন, তাই মিথ্যা।"[৯] 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদুটিকে এখানে চূড়ান্ত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যা চুড়ান্তভাবে সৎ বা অসৎ নয় তাই মিথ্যা। সৎ মানে যা কোন কালে বাধিত হয় না আর অসৎ মানে যা কোন কালে প্রতিভাত হয় না। অদ্বৈত মতে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্রের মত বিষয়ই চুড়ান্ত অর্থে অসৎ। যে বস্তু কোন এক সময় প্রতিভাত হয় আবার কোন এক সময় বাধিত হয় তাই মিথ্যা। স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয়, জাগ্রতকালে বাধিত হয়। ভ্রমপ্রত্যক্ষ ভ্রমকালে প্রতিভাত হয়, সত্যজ্ঞানে বাধিত হয়। তাই স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা, ভ্রমপ্রত্যক্ষ মিথ্যা। কিন্তু অদ্বৈত মতে, জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্ট দিবালোকে আমাদের সকলের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত এই পরিদৃশ্যমান ব্যাবহারিক জগতও মিথ্যা। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে এই ব্যাবহারিক জগতও বাধিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈত বেদান্তে সত্তার স্তরভেদ স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা ভ্রমজ্ঞান, জাগতিক সত্যজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ভ্রমজ্ঞান যা অধিষ্ঠানের জ্ঞানে বাধিত হয় তাকে বলা হয় প্রাতিভাসিক সত্তা। ঘট, পটাদি জাগতিক বিষয়, যা ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয়, তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলা হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞান, যা কোনকালেই বাধিত হয় না তাকে পারমার্থিক সত্তা বলা হয়।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, স্বাপ্ন জ্ঞান, ভ্রম জ্ঞানের ন্যায় কোন যথার্থ জাগতিক জ্ঞান তো বাধিত হয় না- তাহলে অদ্বৈতী তাকে কেন মিথ্যা বলেছেন? অর্থাৎ আমাদের সামনে যে টেবিল, চেয়ার, খাতা, পেন প্রভৃতি রয়েছে, সেগুলো তো ভ্রম নয়, সেগুলো তো আমরা যথার্থই প্রত্যক্ষ করছি- তাহলে এগুলোকে কেন মিথ্যা বলা হয়েছে? উত্তরে অদ্বৈত বেদান্তী বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হলে পরে এগুলোর সত্তাও বাধিত হবে, তাই এগুলোকে মিথ্যা বলা হয়। সাধারণ মানুষের মন ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না। তারা এখনই

জানতে চায়- কেন এগুলোকে মিথ্যা বলা হল? তারা ব্রহ্ম, মায়া এইসব অতীন্দ্রিয় আজগুবি কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না।

তবে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত অপেক্ষা না করেও বলা যায় জাগতিক প্রত্যক্ষ মাত্রই ব্যাবহারিক দশায় বাধিত হয়। যেমন আমার সামনে যে টেবিল আছে তাকে একটু এদিক ওদিক থেকে দেখলে তার মধ্যে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। আলোর ভিন্নতার জন্য একই টেবিল ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হয়। একই বস্তু দূরে নিকটে ভিন্ন ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যারা কখনো নিকট থেকে এরোপ্লেন দেখেনি তাদের নিকট এরোপ্লেন একটা '+' যোগ চিহ্নের ন্যায় দেখায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন নিকট থেকে এরোপ্লেন প্রত্যক্ষ করে, তখন তার নিকট পূর্ব এরোপ্লেন জ্ঞান বাধিত হয়। এভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বেই প্রমাণিত হয় যে ব্যাবহারিক দশায় অনুভূত জাগতিক প্রত্যক্ষ মাত্রই মিথ্যা। এখন প্রশ্ন হল ব্রহ্মজ্ঞান হলে যখন জগৎ মিথ্যা বলে অনুভূত হবে, তখন আমাদের জগৎ বিষয়ক অনুভব কেমন হবে? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে জানতে হলে অদ্বৈত বেদান্তী ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা জানতে হবে।

অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্মস্বরূপ: বেদান্ত দর্শনে 'ব্রহ্ম'ই এক ও অদ্বিতীয় পরমসত্তা। বুৎপত্তিগতভাবে 'বৃংহ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে হয় ব্রহ্ম। ''বৃহি বৃদ্ধৌ' ব্যাকরণের এই সূত্রানুযায়ী 'বৃংহ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি বা ব্যাপ্তি। 'মন' প্রত্যয়ের অর্থ 'অবধিরাহিত্য'। সুতরাং 'বৃংহ + মন' এর অর্থ হয় – 'নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত', অর্থাৎ যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কোন বস্তু নাই, তিনিই ব্রহ্ম। নিরতিশয় ব্যাপক মহান ব্রহ্ম দেশ-কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; সেইহেতু তিনি নিত্য, কারণ যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অনিত্য। ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যিনি নিত্য, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষশূন্য। কারণ যাহা সদোষ, তাহা কদাপি নিত্য হয় না"।[১০]

তবে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে তার লক্ষণ জানা প্রয়োজন। সাধারণত বস্তুর দুই প্রকার লক্ষণ দেওয়া হয় তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। লক্ষণ দ্বারা যার পরিচয় দেওয়া হয়, তাকে লক্ষ্য বলে, আর যার দ্বারা পরিচয় দেওয়া হয় তাকে বলে লক্ষণ। লক্ষণ দেওয়া হয় লক্ষ্যের অসাধারণ ধর্মের দ্বারা। তটস্থলক্ষণের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্"[১১] – অর্থাৎ যে অসাধারণ ধর্ম লক্ষ্যবস্তু যত কাল থাকে, তত কাল তার সঙ্গে সহাবস্থান না করেও তাকে অন্যবস্তু হতে ভিন্ন ভাবে বোধিত করে, তাকে তটস্থলক্ষণ বলে। যেমন 'গন্ধবত্ত্ব' হল ক্ষিতির তটস্থলক্ষণ। ন্যায়মতে, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে এবং মহাপ্রলয়কালে ক্ষিতি পরমাণু থাকলেও তাতে কোন গুণ থাকে না, এমনকি তাতে গন্ধও থাকে না। কিন্তু গন্ধবত্ত্বকেই ক্ষিতির লক্ষণ বলা হয়। কারণ গন্ধবত্ত্বই ক্ষিতি পরমানুকে অন্যান্য পরমানু থেকে ভিন্নভাবে বোধিত করে। অর্থাৎ ক্ষিতি যতকাল থাকে গন্ধ ততকাল তার সঙ্গে না থাকলেও 'গন্ধবত্ত্ব' বলতে ক্ষিতি পরমানুকেই বোঝায়। এইজন্য গন্ধবত্ত্ব ক্ষিতির তটস্থলক্ষণ। এই ধর্ম বস্তুর স্বরূপে প্রযোজ্য নয়, বস্তুর পরিচায়ক মাত্র। অপরদিকে যে ধর্ম লক্ষ্যবস্তু যতকাল থাকে, ততকাল তার সঙ্গে সহাবস্থান করে, তাকে বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ বলে। স্বরূপলক্ষণের পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'স্বরূপং সৎ ব্যাবর্ত্তকম্'[১২] অর্থাৎ যা লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ হয়ে তাকে অন্য বস্তু থেকে ভিন্নভাবে বোধিত করে তাইই হল বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে 'জগজ্জন্মাদিকারণত্ব' হল তটস্থলক্ষণ। কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা হওয়ায়, সেই কল্পিত জগতের কারণত্ব দ্বারা ব্রহ্মকে অন্য বস্তু থেকে ভিন্নভাবে বোধিত করায় তা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। আবার যখন বলা হয় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম' তখন তা হয় ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। কারণ সত্যাদি পদার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ হয়ে অন্য বস্তু থেকে ব্রহ্মকে ভিন্নরূপে বোধিত করে। ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদ রহিত। আমরা জানি যে ভেদ তিন প্রকার যথা স্বগতভেদ, স্বজাতীয় ভেদ এবং বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম এই তিন প্রকার ভেদ থেকেই মুক্ত। সুতরাং যখন আমাদেরও ব্রহ্ম জ্ঞান হবে তখন আমাদেরও জগৎ বিষয়ক সকল প্রকার ভেদ রহিত নির্গুণ, নির্বিশেষ জ্ঞান

হবে। আমরা নিজেদেরকে অদ্বয় শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অভিন্নরূপে অনুভব করতে পারব। উপনিষদের ঋষি এই অনুভবকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।

অর্থাৎ "হে বিশ্ববাসী শ্রবণ কর – আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি, অন্তরে অনুভব করেছি এবং জেনেছি যে তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নয়। তোমাদের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই- তোমরা প্রত্যকেই দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র। তোমাদের বসবাস মলিন মাটিতে নয়, আলোকিত দিব্যধামে। হে বিশ্ববাসী শ্রবণ কর –জগতের প্রতিটি বস্তু, কণা, অনুকণা তোমার অপর নয়, তাদের প্রত্যকের সঙ্গে তুমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, কেননা এই বিশ্বসংসার সেই মহান পুরুষ থেকে উৎসারিত ও সেই মহান পুরুষে বিধৃত। আরও শ্রবণ কর- সবই ব্রহ্ম বা আত্মা। তুমিই সেই মহান পুরুষ ব্রহ্ম বা আত্মা- 'তৎ ত্বম অসি'। উপলব্ধি কর 'আমিই ব্রহ্ম' – 'অয়ম ব্রহ্মাস্মি'। জীবই স্বস্বরূপে ব্রহ্ম। জীবাত্মাই স্বস্বরূপে পরমাত্মা"।[১৩] বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এইরূপ অনুভবকে ব্যক্ত করেছেন। মহাদের দাস বৈরাগ্য লিখেছেন, "বৈদিক ঋষির চেতনায় মানুষ অমৃতের সন্তান। অমৃতের অনুভূতি তার সত্তার গভীরে বিরাজমান। কিন্তু অজ্ঞানাবদ্ধ জীব তার অন্তর্নিহিত অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করতে না পেরে সুখভোগে লিপ্ত হয় ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু তার অন্তরে প্রবাহমান এই অমৃত অনুভূতির আবেশ কোন এক মুহূর্তে যদি ক্রিয়াশীল হয়, তখন সে করে অমৃতের অনুসন্ধান। যার প্রকাশ ঘটেছে শাস্ত্র বাক্যে। এই শাস্ত্রবাক্য থেকে সে উত্তরণের পথে এগিয়ে চলার নির্দেশ পায়। এই চলার পথ হল সত্য দর্শনের, জীবনচর্চার। কেবল বৌদ্ধিক আলোচনা নয়, জীবনে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নতুন থেকে নতুনতর পথের অনুসন্ধান তার লক্ষ্য হয়। ভারতের দার্শনিক ভাবনা তাই কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষার্থতত্ত্ব প্রভৃতি ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আনন্দময় জীবনচর্যার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্যাপী পরমকল্যাণের প্রতিষ্ঠাতেই তার পর্যাবসান। এই সত্যের ভাবনা, শিবের বা মঙ্গলের অনুশীলন, সুন্দরের সাধনা মানুষকে এক উন্নততর ও মহত্তর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে"।[১৪] এইভাবে ব্রহ্মের সহিত আমাদের এবং সমগ্র জগতের অভিন্নতার অনুভবই অদ্বৈত বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য। কীট-পতঙ্গ থেকে মনুষ্য পর্যন্ত সকলের সহিত একান্ত অভেদই এই শাস্ত্রের মূল শিক্ষা। এই অভিনব তত্ত্ববিদ্যা থেকে যে নৈতিক দর্শন অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হয়, তার দ্বারাই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি - কেন আমরা চার্বাক সুখবাদ বর্জন করে সকল প্রাণীর সহিত সাম্য, করুণা ও মৈত্রীর ভাব পোষণ করি।

জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী নীতিদর্শনের তুলনাঃ জড়বাদী চার্বাক ও তাদের মতানুসারী ব্যক্তিগণ মনে করেন, চার্বাকদের নীতিবিদ্যায় মানুষের জাগতিক সুখের কথাই বলা হয়েছে। মানুষ যেন পরকালের অনাবিল সুখের আশায় বর্তমানের সুখ পরিত্যাগ না করে- সেটাই তাদের কামনা। যেমন দেবব্রত সাহা তার প্রবন্ধে বলেছেন, "চার্বাকদের দৃষ্টি আবদ্ধ নির্দিষ্ট জীবনের সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তারা এই খণ্ডিত জীবনের পটভূমিতেই চরিতার্থ করার অভিলাষী। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের বৃহত্তর অংশ এই চার্বাকী চিন্তারই অংশীদার। মোক্ষ, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্কের বিষয়বস্তু এবং মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টায় বর্তমান জীবনকে সর্বতোভাবে সুখী করার প্রয়াসেই ব্যয়িত"।[১৫] অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী নৈতিক চিন্তার বিরুদ্ধে চার্বাকদের মস্ত অভিযোগ হল, তারা মানুষের বর্তমান জীবনের সুখের তুননায় পরলোক বা ভবিষ্যতের কোন এক অজানা সুখের কল্পনায় তাকে নিয়োজিত রাখতে বেশী প্রয়াসী। মানব সমাজের বৃহত্তর অংশ এইরূপ চার্বাকী চিন্তার অংশীদার কিনা আমি জানি না, তবে আমার অন্তত মনে

হয় না, অধ্যাত্ম চিন্তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ স্বীকার করা যায়। কেননা অধ্যাত্মচিন্তার পরাকাষ্ঠা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-

বিহায় কামান্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ২/৭১

অর্থাৎ যিনি অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করেন এবং 'আমি ও আমার' এই ভাব পরিত্যাগ করে অহঙ্কারশূন্য হন, তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। এখানে ভগবদগীতায় স্থিতিপ্রজ্ঞব্যক্তির অবস্থা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছেন, এইরূপ ব্যক্তি বর্তমান জীবনেই পরম শান্তি বা অনাবিল আনন্দ লাভ করেন। এই শান্তি মৃত্যুর পর বা ভবিষ্যতের কোন সময় নয়, তা এই ঘটমান বর্তমানেই সম্ভব। আবার চার্বাকগণ বলেন, বর্তমানের সুখ দুঃখমিশ্রিত হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। "দুঃখ মিশ্রিত বলে ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। যা আবর্জনীয়রূপে সুখের সঙ্গে এসে পড়ে, সেরূপ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে সুখকে ভোগ করতে হবে। তাই চার্বাকষষ্ঠীতে বলা হয়েছে, 'বিষয় প্রাপ্তী জন্য সুখ দুখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে- এ ধরণের বিচার মুর্খতার পরিচায়ক"।[১৬] এর বিপরীতে ভগবদগীতায় বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে সুখ লাভ করেন তা কোন ক্ষণস্থায়ী বর্তমান কালীক সুখ নয়, তা অন্তকালব্যাপী স্থায়ী। সেখানে বলা হয়েছে-

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।। ২/৭২

অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনি আর মোহপ্রাপ্ত হন না এবং অনন্তকাল পর্যন্ত এই স্থিতিতে সুখে অবস্থান করেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, চার্বাকগণ সুখের কথা বলেছেন আবার ভগবদগীতায়ও সুখের কথা বলা হয়েছে। চার্বাকগণ বলেছেন, দুঃখ মিশ্রিত বলে সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ভগবদগীতায় বলা হয়েছে সুখ-দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ কর (সুখদুঃখে সমে কৃত্বা,২/৩৮)। তাহলে উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? উত্তরে বলা যায়, চার্বাক বলেছেন, 'সুখকে ভোগ কর' আর ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, 'সুখে থাক'। কিন্তু 'সুখকে ভোগ কর' আর 'সুখে থাক' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? যারা সুখকে ভোগ করার কথা বলেন, তারা ভোগবাদে বিশ্বাসী, আর যারা সুখে থাকার কথা বলেন, তারা ত্যাগে বিশ্বাসী। সুখে থাকতে হলে শুধু ভোগ করার প্রয়োজন হয় না, ত্যাগের মাধ্যমেও সুখে থাকা যায়। তাই তারা বলেছেন, 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জিথা' (ঈশোপনিষদ্-১)- অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ কর। কিন্তু সেখানে আরও বলা হয়েছে 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' (ঈশোপনিষদ্-২)-অর্থাৎ ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত কর। আর এখানেই এই মতবাদের সার্থকতা। চার্বাকগণ আরও বলেছেন, মোক্ষ তর্কের বিষয়, একটি কাল্পনিক প্রলোভন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদী বিভিন্ন নীতিদর্শনে মোক্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা থেকে এই ধারণার অযৌক্তিকতা সহজেই বোঝা যায়। মোক্ষবাদী দার্শনিকগণ মোক্ষ, মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি বিভিন্ন নামে মোক্ষকে অভিহিত করেছেন। তবে যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন এরা বেশিরভাগই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলেছেন। অদ্বৈত বেদান্তী মোক্ষকে আনন্দময় অবস্থারূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও এদের প্রায় কেউই মোক্ষকে বর্তমান জীবনে অসম্ভব বলেননি। বর্তমান জীবনে মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়। জীবন্মুক্তের লক্ষণে সদানন্দ তাঁর বেদান্তসার গ্রন্থে বলেছেন, "স্বস্বরূপভূত অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বাধপূর্বক স্বরূপভূত অখণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান, অজ্ঞানকার্য(স্থূল ও প্রপঞ্চ), সঞ্চিতকর্ম, সংশয়, বিপর্যয়(ভ্রম) জ্ঞান

প্রভৃতিও বাধিত হওয়ায় সকল প্রকার বন্ধনশূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষই জীবন্মুক্ত নামে আখ্যাত হন"।[১৭] আচার্য শঙ্কর মোক্ষকে আনন্দময় অবস্থা বলেছেন, আর তিনি জীবন্মুক্তিও স্বীকার করেছেন। সুতরাং এই জীবনেই মানুষ মোক্ষ লাভ করে অনাবিল আনন্দস্বরূপে অবস্থান করতে পারেন।

চার্বাকপন্থী কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কোন মানুষ যদি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ সহ্য করার পর মোক্ষ লাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন, তাহলে তো তিনি তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারলেন না। আর যেহেতু পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই সেহেতু পরজন্মেও তার সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ভবিষ্যৎ সুখ বা মোক্ষের আশায় দুঃখ সহ্য করার চেয়ে প্রথম থেকেই আত্মসুখে মগ্ন হওয়া শ্রেয়। অধ্যাত্মবাদী কোন কোন সম্প্রদায় এর উত্তরে পুনর্জন্মের উল্লেখ করে থাকেন, কিন্তু পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ ব্যাতীতই এর উত্তর দেওয়া সম্ভব। ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তে।। ৩/২১

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তাকেই অনুসরণ করে। সুতরাং কোন মানুষ যে ধরনের আচরণ করবে তার অনুসারী তার পুত্র, কন্যাদি সকলেই সেই সেই আচরণে অভ্যস্ত হবে। এই জন্যই প্রবাদে আছে, 'Charity begins at home.' কিন্তু আত্মসুখে মগ্ন কোন ব্যক্তির পুত্র, কন্যারাও যদি অনুরূপ হয় তাহলে শুধু তার শান্তি নয়, তার সম্পূর্ণ সংসারের শান্তিই যে কিরূপ বিঘ্নিত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহারঃ অদ্বৈত তত্ত্ববিদ্যা ও তাদের আনুষঙ্গিক নীতিবিদ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কেন আমরা চার্বাকদের জড়বাদী নৈতিক ধারণা পরিত্যাগ করে অপরের দুঃখে অশ্রুপাত করি ও কেন জগতের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা করি। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা সাময়িকভাবে জগতের বিভিন্নতাকে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ এবং শুদ্ধচৈতন্যরূপে আমরা জগতের সকলের সহিত অভিন্ন। এই অভিন্নতা আমাদের মূল স্বরূপ বলেই আমরা নিজের স্বার্থ চিন্তা মুক্ত হয়ে সকলের স্বার্থ চিন্তা করি। আর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি বশতঃ যে সকল মানুষ আপন স্বার্থ চিন্তায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছে এবং সমাজ ও সংসারের অনিষ্ঠ চিন্তা করে, তাদেরকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার উপায় হল তাদের মধ্যে অদ্বৈত তত্ত্বচিন্তার বিস্তার ঘটানো। কেননা একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্বের আলোকেই তারা নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে ও জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারবে।

সূত্র নির্দেশ:

১। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট, কলকাতা, ২০১৮, পৃ-৭৬।
২। শাস্ত্রী, শ্রীপঞ্চানন, চার্বাক-দর্শনম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ-ভূমিকা(ঘ)।
৩। শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন, চার্বাক দর্শনম্, পৃ-১৮।
৪। গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-১৮।
৫। শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন, পৃ-৪।
৬। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, পৃ-৯০।
৭। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, পৃ-৩৩২।
৮। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, পৃ-৩৪২।

৯। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, পৃ-৩৪২।

১০। বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী, বেদান্তদর্শনম্, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৯০।

১১। বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী, পৃ-৯৭।

১২। বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী,পৃ-৯৭।

১৩। ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, পৃ-৬৬।

১৪। Bairagya, Mahadeb Das, *Pratidhwani the Echo,* Shivpurane Vedanta Bhavana: tulanamulaka Parjalochana, Department of Bengali, Karimganj College, Vol-VI, Issue-III, January 2018, pages 54-62.

১৫। Saha, Debabrata, Pratidhwani the Echo, Charvak Nititattwe Sukhavadi Bhavana: Ekti Samiksha, Department of Bengali, Karimganj College, Vol-IV, Issue-IV, April 2016, page no.7-12.

১৬। Saha, Debabrata.

১৭। পাল, বিপদভঞ্জন, বেদান্তসার, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৬২